স্বাধীনতার ৭৫ বছর ও বাঙালি উদ্বাস্তুর কণ্ঠস্বর

নিখিলেশ বিশ্বাস

ভারতের স্বাধীনতার পচাত্তর বছর এবার। যদিও স্বাধীনতার প্রকৃত সূচণা ১৯৫০-র ২৬শে জানুয়ারি। সে যা-ই হোক এই সময়ে এসে আমাদের বাঙালি সমাজের বুকের বেদনা বার বার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে । কারণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী পূর্ব পুরুষেরা যে দেশের স্বপ্ন বুকে নিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, সে ছিলো অখন্ড ও ঐক্যবদ্ধ ভারত । যার জীবন্ত প্রতীক ও প্রথম মহা নায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও তার মহাজাতিক সেনা দল," আজাদ হিন্দ বাহিনী "। মূলত তাদের বীর-বিক্রমের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমকালেই বৃটিশ বুঝে গিয়েছিলো তার দিন শেষ । সঙ্গে ছিলো বাংলা সহ ভারতের নানা রাজ্যের অজস্র আত্ম বলিদানকারী গণবিপ্লবী। যাদের মধ্যে কেউ সশস্ত্র ও কেউ বা অহিংস বিপ্লবী ।

কিন্তু একদিন যে বাংলার ভৌগলিক সীমা ছিলো হায়দ্রাবাদ, গুজরাট, বম্বে, মাদ্রাস বাদে সমগ্র মধ্য ভারত তথা বিহার উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ। পরে সমগ্র অবিভক্ত আসামও ছিল এক সময়ে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অধীন । যার পূর্ব সীমান্ত ছিলো বার্মাহ । এটা আমরা দেখেছি ১৮৭৪এর আগের একটি মানচিত্রে *১। কারণ ১৮৭৪এ ব্রিটিশ শাসকেরা খাজনা বৃদ্ধির জন্য বাংলার গোয়াল পাড়া ও বরাক অঞ্চলকে কেটে জুড়ে দেয় আসামের সঙ্গে ।সেই আমাদের প্রথম বঙ্গ ভঙ্গ । যে অংশ আসামে নিয়েযায় তার জন-পরিচয়ে ৯৯% ই ছিল বাংলাভাষী ।সেদিন তাদের জন্য কলকাতার বা আমাদের বনেদী নেতাদের কেউ কোনো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন করেননি। তাদের অভিলাসী -অংশ মুখ্যত চেষ্টাকরেছে 'ওয়ার্ড-বুক' পড়ে ছেঁড়া -ফুটো ইংরেজি শিখে ইংরেজ প্রভুদের প্রসাদপুষ্ট হতে, তথা কোনো, "ব্রিটিশ-প্রিয়-বনেদী দেশীয়দের সুপারিশে ডেপুটি হইয়া সুখে দিন কাটাইতে "।

তারপর বঙ্গ ভঙ্গ এল ১৯০৫ সালে। তখন বাংলার লর্ড কার্জন ও মুখ্য সচিব মিঃ আমেত (Cayan Uddin Ahmet) । তারা ঠিক করেন চট্টোগ্রাম,ঢাকা, ও রাজশাহী বিভাগ এবং পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, সিলেট , কূমিল্লা যাবে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশে। পশ্চিমের হিন্দীভাষী রাজ্য কোটা-নাগপুর(যার মধ্যের Changbhakar, Korea, Surguja,),ও জামশেদপুর রাজ্য বাংলা থেকে যাবে মধ্য প্রদেশে, আর সম্বলপুর রাজ্য,আরওড়িষ্যার ৫টা রাজ্য (যথা বামরা,রাউড়খোল(Rairakhol), সোনেপুর ,পাটনা এবং কালা হান্ডি) আসবে মধ্য

Society Language and Culture

প্রদেশ থেকে বাংলায়। মুলত বাংলা কে ভেঙে চুরে খন্ড বিখন্ড করার বিরুদ্ধে সে দিন বাংলার বিবেকবেন মানুষ রাস্তায় নেমে ছিলেন। রবীন্দ্র নাথ লিখে ছিলেন "ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা" সহ অসাধারণ সব গান। – এই প্রস্তাব ১৯১১ সালে স্থগিত হয়ে যায়। কারণ তখন বিশাল আন্দোলন আয়োজিত হয়। এর পরই ব্রিটিশ তাদের রাজধানী নিয়ে যায় তাদের বশংবদদের মিলন ক্ষেত্র দিল্লিতে।

তারপর আসে ১৯৪৭সাল স্বাধীনতার নামে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ । বলা উচিত সবচেয়ে মারাত্মক দেশভাগ। কেবল রাজ্য ভাগ নয় একে বারেই ভিন্ন দেশ করে নেওয়া । যার অভিশাপে প্রায় তিন কোটি বাঙালি উদ্বাস্তু আজ সারা দেশে তাদের বাঙালিত্ব হারানো এক অভিশপ্ত প্রজাতি। যদিও বৃহত্তর ভারত নামক উপমহা দেশের পক্ষে

তাতে তেমন কিছু যায় আসে না । কারণ সারাদেশকে বৃটিশ আর হয়তো চটাতে চায়নি। যে বাংলাকে শেষ করা তাদের পরিকল্পনতেছিল , তাতে তো কোনো বাধা হচ্ছিলো না। তার দালালরাও এর কোনো প্রতিবাদ করে নি। কেবল এই দুই বিপ্লবী-রাজ্যকে ভাগের চক্রান্ত করেছিলো বৃটিশ ও পশ্চিমারা ।

বুদ্ধি ও চেতনায় বাংলা ছিলো স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাগ্রে, বৃটিশের সেই ডিভাইড এন্ড রুল "নীতি অনুসরণ করে" গান্ধী নেহরু বিধান রায়,প্যাটেল থেকে শ্যামা প্রসাদ বাংলাকে এক্ষেত্রে দুয়োরাণি আর পাঞ্জাবকে শুয়ো রানি করে তুলল । যে নেহরু আসামের বাঙালি উদ্বাস্তুদের এক পরিবারকেও অন্য রাজ্যে পাঠাতে রাজী হননি , সেই তিনিই বিধান রায় ও শ্যামা প্রসাদদেরকে নিজের পক্ষে নিয়ে বাংলার শ্রমজীবী গরিব উদ্বাস্তু তথা নিম্নবর্ণের বাঙালি উদ্বাস্তুদের দন্ডকারণ্য আর কালা পানির-দেশ আন্দামানসহ প্রায় ভারতের ১৭/১৮টা রাজ্যে সতীর ছিন্ন দেহের মতো ছিঁড়ে-ফুঁড়ে পাহাড়ে জঙ্গলে অনাবাদী পাথুরে জমিতে আর অরণ্যের নানা শ্বাপদ সংকুল স্থানে ফেলে দিলো।

দন্ডকারণ্যে প্রথমে কিছু বাংলা স্কুল থাকলেও পরে ১৯৮০সালে সে প্রোজেক্ট গুটিয়ে দেবার নামে প্রথমে ঐ অঞ্চলকে তিনটি রেজ্যে ও পরে তাদের পাঁচটি রাজ্যে পাঁচটি ভাষার স্কুলে ঢুকিয়ে দিয়ে মাতৃভাষা হীন করে দেওয়া হল। । ভেঙে ফেলা ও মূলোৎপাটিত বৃক্ষ যেমন নতুন জায়গায়ও কোন মতে বাঁচার চেষ্টা করে তেমনি এই উদ্বাস্তুরা ভারতের নানা অঞ্চলে কেবল বাঁচার চেষ্টায় মগ্ন থাকতে বাধ্য হল।

Society Language and Culture

সচেতন পাঠক স্মরণ করুন, যখন এদের পূর্ববঙ্গের ছেড়ে আসা সহোদরেরা ভাষা আন্দোলন করছে, সেই পথে ভাষারাষ্ট্র গড়ে তুলছে, তখন তাদেরই এপারে আসা সহোদরেরা মাতৃভাষা ভুলে যে কোন ভাবে অন্নজলের হাহাকারে দিন কাটাচ্ছে। কারণ গান্ধী যেমন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে অনশন রত পেরিয়ার স্বামীকে(তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিকারের কথা পার্টির সিদ্ধান্তে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়ে ছিলেন), তেমনি তার চক্রান্তে ১৯৩৮সালে নেতাজিকে কংগ্রেসের সভাপতি পদ প্রাপ্তির পর এক বছরের মধ্যেই ছাড়তে বাধ্য হন, আর তেমনি পুর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের যে সব প্রাণঢালা(!) প্রতিশ্রুতি গান্ধিনিজে ও তার নেতৃত্বে কংগ্রেস দিয়েছিল ; পরে তা কংগ্রেস পদে পদে সে সব লংঘণ করে বাঙালি উদ্বাস্তুদের চরম সর্বনাশ করেছে । এমন কি কোথাও এই বাঙ্গালিদের এক অঞ্চলে বেশি মানুষের বসতিও দেয়নি।যদি তারা শক্তি ধর হয়ে পড়ে?

তাই যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্বাস্তুদের অঢেল ব্যবস্থা আর বাঙলিদের অঢেল অব্যবস্থায় ডুবিয়ে দিয়ে পরস্পর থেকে দুরত্ব সৃষ্টি করেছে ।যাতে তারা স্বাধীনতা পূর্ব কালের মতো বাঙালি-পাঞ্জাবির বিপ্লবী ঐক্য না গড়ে তুলতে পারে । সারা জীবন এই সব চক্রান্ত করে অবশেষে গান্ধী আর এক চক্রান্তকারী তথা রাম রাজত্ব পন্থী নাথুরামের হাতে নিহত হলেন। অন্য দিকে পশ্চিমাদের সুদূর প্রসারী চক্রান্তে বাঙালি দলিত উদ্বাস্তু সারা ভারতে মরতে মরতে টিকে আছে। যারা ভাষা হীন, আশাহীন এক অনিকেত জাতি হিসেবে কেবল ভেসে চলেছে । এই ৭৫বছরেও তাদের নেই নাগরিকত্বের যথার্থ নথিপত্র, জমির সুষ্ঠু কাগজ পত্র, হয়নি জমির সীমাঙ্ক নির্ধারণ। পায়নি সংবিধাবনের নির্দেশ মতো জাতি পত্র। তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক । তাই বাস্তবত দেশের সাংবিধানিক অন্যান্য অধিকার পর্যন্ত তাদের নেই। আজও মহারাষ্ট্রে এই জটিলতায় তাদের চাকরী পাবার সব আশা আটবাঁও জলে তলায় । এর জন্য মুখ্য পাপ বৃটিশ অনুগামী পাশ্চিমা ক্ষমতাধর কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা মার্কা জাতীয়তা বাদী রাজনীতিক দলগুলির নেতাদের । তারাই সুভাষহীন-ভারতে স্বাধীনতার দধি-ভান্ডটি তাদের প্রভুদের হাত থেকে রাতের অন্ধকারে হাত বদল করে নিয়েছিলো। সে জন্য একাংশের কমিউনিষ্টরা হয় তো সেদিনের এ স্বাধীনতাকে "ঝুটা-আজাদি" বলে ছিলো। জানি না এসবের কোনো ব্যখ্যা ইতিহাস অনুমোদন করে কিনা ?!

স্বাধীনতার এই ৭৫বছরের দাঁড়িয়ে আমি একজন উদ্বাস্তু ঘরের সন্তান হিসেবে এই স্বাধীনতা দিবসকে তাই দেখি সত্যিকারের বঙ্গ-ভঙ্গ দিবস হিসেবে । তাই আমাদের কাছে এটা কোন

Society Language and Culture

আনন্দের দিন নয় বেদনার শতধা অশ্রুধারা বিসর্জনের দিন । আবার বলি পাঞ্জাব আর বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামে সবচাইতে বেশী আত্ম উৎসর্গকারী জাতি। সেই মানুষের প্রাণপ্রিয় বাসস্থান বিভাজিত করা হয় ইংরেজের সঙ্গে তৎকালীন কংগ্রেস-মুসলিম লীগের, হিন্দু পন্থী বলা উচিত দক্ষিণপন্থী মৌলবাদী আর ধনী ও বর্ণান্ধদের চক্রান্তে । নবজাগরণের অগ্রগামী চিন্তাধারার বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ অবিভক্ত বাংলার প্রতি তাদের যে বিদ্বেষ তারই বহিঃপ্রকাশ এই বাংলা ভাগের চক্রান্তের মহা অপরাধে নিহিত । আর ছিলো মুসলিম ও দলিত ঐক্য শক্তির ভয়। তাহলে তো বাঙলার মুখ্য মন্ত্রী কোনো ব্যানার্জি, রায়, ঘোষ বোস, ভট্টাচার্য বাবুরা হতে পারবেন না। হবেন ফজলুল হক , মুজিবর অথবা যোগেন মন্ডলের কেউ। সকলেই জানেন আমাদের উজ্জ্বল ঐতিহ্য চট্টগ্রাম বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ, আমাদের সাঁওতাল বিদ্রোহ, আমাদের মুন্ডা বিদ্রোহ, আমাদের অজস্র কৃষক বিদ্রোহ, আমাদের নৌবিদ্রোহ , আমাদের শ্রমিক-কৃষকের নানা আন্দোলন, নানা গ্রুপের সশস্ত্র আন্দোলন, আমাদের ছাত্রযুবদের আন্দোলন, আমাদের তেভাগার মহান আন্দোলন ইংরেজের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল।। এ বিভাজন হল তারই ব্রিটিশ প্রদত্ত শাস্তি কিন্তু তা এলো এই দেশীয় বর্ণবাদী, বাঙালি বেদ্বেষী শাসকদের কালো হাত দিয়ে ।

২

কেউ কেউ জানেন যে আমি আমার জীবনের দীর্ঘ সময় অন্যান্য কাজের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সমীক্ষার কাজে ব্যয় করেছি। সে জন্য নানা রাজ্যে পরিভ্রমণ করেছি। আমি দেখেছি সারা ভারতের প্রায় সমস্ত জায়গায় বাঙালির অস্তিত্ব ও প্রভাব মরা-নদীর স্রোত ধারার মতো শুকিয়ে আসছে ও গেছে। ১৯০৫-১১ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে ১৯১২ সালে রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বাংলার পরে প্রকাশ্য অবিচার শুরু হয় । স্বাধীনতার পরে কেন্দ্র- রাজ্য সম্পর্কের সূত্রে, মাশুল সমীকরণসহ নানা পথে সেই অবিচার সমানভাবে চলেছে। আজও নানা আইনী ও বে- আইনী পথে তা চলে আসছে।

আরো দুঃখের কথা পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকার বিশেষ করে বিধান রায়ের নেতৃত্বে সরকার এই নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তুদের সারা ভারতে নানা স্থানে অযত্নে-অবহেলায় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা না করে ফেলে দিয়েএসেছিল। পরে আর তাদের দিকে একবার তাকিয়েও দেখে নি। ভাবুন এক জন শিখ বা একজন বিহারী গোয়ালা অন্যত্র আক্রান্ত হলে

Society Language and Culture

তাদের জন্য সে রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী পর্যন্ত উদ্বেল হয়ে ওঠেন। এই তো গত বছর মেঘালয়ে আক্রান্ত বাঙালির জন্য এরাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী তো দূরের কথা একটি কোনো দলের পক্ষ থেকে কেউ কোনো প্রতিবাদ কপ্রেছেন ? ০০জানিনা। কিন্তু ওরই পাশে পাঞ্জাবী শ্রমজীবী দের জন্য সে রাজ্যের নেতৃত্ব কি ভাবে তাদের উদ্ধারে ঝাপিয়ে পড়ে ছিলো। আমাদের পাশের প্রতিবেশি আসাম তো জাত-বাদীতায় চরম উগ্র এমন কি জাতীয় সং হতি ধ্বংসকারী ।ঙ্গার উড়িষ্যায় রয়েছে একজন অড়ীয়া মন্ত্রী। যা অতি উদার বাঙলা এখনও স্বপ্নেও দেখেনা ।-এমন নিষ্ঠুর সে নীরবতা । !

স্বাধীনতার পরপরে এই দলিত বাঙালি উদ্বাস্তু বিরোধী বর্ণান্ধ রাজনৈতিক নেতারা এমন কি পুনর্বাসনের পরিকল্পনায়ও এমন একটা ব্যবস্থা করেছিল যাতে কোনো একটা অঞ্চলে বা কোন একটা রাজ্যে বাঙালিরা উদ্বাস্তুরা ব্যাপক সংখ্যক না পুনর্বাসন পায়। যাতে তারা সেখানে একটা শক্তি হয়ে উঠতে পারে । এটা হোত পারতো না যদি এরাজ্যের শাসক-শক্তি

তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাঙালি বিরোধী , সুভাষ বিরোধী , কমিউনিষ্ট বিরোধী শাসক দের সঙ্গে সহ মত হোতেন।

আমি আপনাদেরকে আরেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি আসামে বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বা ত্রিপুরায় যারা গিয়েছিল তাদের কাউকে কিন্তু ভারতের অন্য রাজ্যে সেখানকার রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার পরিকল্পনা করে পাঠায়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বর্ণহিন্দুরা উদ্বাস্তুদের যে অংশটা উচ্চবর্ণের তাদের যে কোনোভাবেই হোক পশ্চিমবঙ্গে রেখে দিয়েছে। কিন্তু তাদের যে নিম্ন বর্ণের মানুষ,তাদেরকে এরাজ্য থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে এইসব বন-জঙ্গলে। কোথাও বাঘ-ভালুকের সামনে গভীর বনাঞ্চলে , কোথাও আন্দামানের কালাপানিতে জারোয়াদের তীরের সামনে, কোথাওবা পাহাড়ের নিচে অনাবাদী অরণ্য অঞ্চলের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে । অর্থাৎ এই বনেদী বাঙালিরা ঐ উদ্বাস্তুদের কে তাদের ভাষা সহোদর ভাবতেও ঘৃণা বোধ করেছে। তারা জানতো আমাদের ছেলে মেয়েতো ইংরেজি জানে, এই ঝি চাকরের ছেলে মেয়েদের যাইচ্ছে হয় হোক। এক্লহানেই বিহারের অল্প সংখ্যক হিন্দি ভাষীর সংহত হবার চেষ্টার সঙ্গে মূল পার্থক্য। তাই আজ বাঙালি কাঙালি । নানা রাজ্যে খাচ্ছে ঝাঁটার বাড়ি। বনেদীরা ভাবতো আসলে ওরা তো ভোটের বোড়ে । তার আগে বা পরে তাদের আর কি ইবা প্রয়োজন।?

Society Language and Culture

এই প্রায় দুই কোটি উদ্বাস্তুরা বুক ঘষে ঘষে বেঁচে থেকেছে সারা ভারতবর্ষে । এই বাঙালি রবীন্দ্র নজরুলের সাহিত্য জানে না , এরা হরিচাঁদ গুরুচাঁদের ধর্মহীন, লোকায়ত সংস্কৃতি হীন । এক ভয়ঙ্কর জীবনের ভিতরে গিয়ে পড়েছে। বলা উচিত তাদের চক্রান্ত করে ফেলা হয়েছে ।আমি জানিনা আগামী কোন ইতিহাস গবেষক এই মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন । সাতদশকের স্বাধীনতার পরেও এই মানুষদের এখন প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে , নাগরিকত্ব দেয়া হবে বলে অর্থাৎ ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬ এমনকি ১৯৭০ সাল পর্যন্ত নানা কারণে যারা এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব দেয়া হয় নি। কারা এই পাশবিক সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী, আর কারা এর যথার্থ প্রতিবাদ না করেও বিরোধী নেতার পোষাক পরে এই বাঙলায় আজও ঘরে বেড়াচ্ছেন ? উদ্বাস্তুরা কি জানেননা , ২০০৩ সালে বিজেপি আদবাণি-বাজপেয়ীর নেতৃত্বে তাদের নাগরিকত্ব হরণ আইন করে বিশ্ব নিন্দিত হয়েছে। বিজেপির সেই হন্তারকেরা সেই ,কাপালিকেরা এখন হাতের খড়্গ লুকিয়ে এসেছে সাধুর ছদ্মবেশে , উদ্ধার কর্তা সেজে। সেই তাদের পক্ষে গিয়ে দাঁড়াবেন, আপনিও ? না আপনার হাতের শেষ বল্লমটি শত্রুর দিকে তাক করে ধরবেন?

হিটলার যেমন ইহুদী ও গণতন্ত্রীদের নিধণ করতে কনস্ত্রেশন ক্যাম্প তৈরি করে ছিলো , তেমনিই ডিটেনশন ক্যাম্পের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে এই ভণ্ড কাপালিকের দল বিজেপি । আমাদের আশংকা আজও যদি বাঙালি উদ্বাস্তু, ভারতের সমগ্র দলিত সম্প্রদায় আর সংখ্যালঘু মুসলিমরা ঐক্য বদ্ধ ভাবে এর প্রতিরোধ সংগ্রামের এক সরণীতে না এসে দাঁড়াতে পারে, তা হলে আসাম থেকে আন্দামান, উত্তরা খণ্ড থেকে গুজরাট,কর্নটক, মাহারাষ্ট্র থেকে অড়িশা সমগ্র ভারতে হিটলা-এর ৮০লক্ষ মাত্রনয় আজকের এই নয়া ফ্যাসিস্তদের রামরাজত্বে কয়েক কোটি বাঙালি, দলিত ও মুসলমান খুন হবে। অথবা চির দিনের জন্য শূদ্র বা বন্ডেড লেবারের জীবন যাপন করতে হবে মনুসংহিতার নির্মম বিধান অনুসারে।

Society Language and Culture